পিতাপুত্র - সংবাদ

নারায়ণ সান্যাল

১৯৬১ আমি তখন দণ্ডকারণ্যে ডেপুটেশনে কাজ করি। ওড়িশায় কোরাপুটে। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তপসিলী উপজাতির কমিশনার তথা পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ দফতরের কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী অনিলকুমার চন্দ দণ্ডকারণ্য পরিদর্শনে এসেছেন। রাত্রে চেয়ারম্যানসাহেব তাঁর বাড়িতে একটা নৈশভোজের আয়োজন করলেন। আমরা এগারোজন নিমন্ত্রিত ছিলাম---নয়জন বাঙালি, দু'জন অবাঙালি; চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মিস্টার ও মিসেস জনসন। চেয়ারম্যান তদানীন্তন ভারতের সিনিয়রমোস্ট আই. সি. এস., স্বনামধন্য পদ্মবিভূষণ সুকুমার সেন। 'আফটার - ডিনার টক' হিসাবে অনিলকুমার তাঁর জীবনের একটি দুর্বল অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতাটি তখন পনেরোবছরের পুরাতন।

ভারত তখন পরাধীন। জিন্না - ঘোষিত 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'। ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ সদ্য- অতিক্রান্ত। সমস্ত ভারতবর্ষ জ্বলছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নিতে। নেতারা দিশাহারা। মহাত্মাজী তখন সেবাগ্রামে। কী একটা কাজে অনিল চন্দ্র শান্তিনিকেতন থেকে সেবাগ্রামে এসেছেন মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করতে। আছেন আশ্রমের অতিথিশালায়, গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলছেন, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। যন্ত্রটা ছিল দু-জনের মাঝামাঝি। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন শায়িত। তাই অনিল চন্দ রিসিভারটা তুলে নিয়ে শুনলেন। অবাক হয়ে বললেন, বাপুজী, ওপাশ থেকে পণ্ডিতজী বলছেন, ধন।

--পণ্ডিতজী ? জবাহর ? দেহ্লীসে কেয়া ?

হাত বাড়িয়ে যন্ত্রটা নিয়ে শুনলেন। নির্বাক একটানা অনেকক্ষণ শুনে শুধু বললেন, 'ঠিক হ্যায়।' যন্ত্রটা স্ব-স্থানে নামিয়ে রেখে অনিল চন্দকে জানালেন এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ, হ্যাঁ, জবাহরলালা নেহই ও-প্রান্ত থেকে কথা বলছিলেন বটে, তবে দিল্লি থেকে ট্রাঙ্ককলে নয়। আহ্মেদাবাদ স্টেশনের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর ঘর থেকে। ওঁরা তিনজন এইমাত্র দিল্লি থেকে এসেছেন আহ্মেদাবাদ এক্সপ্রেসে।

অনিল চন্দ শুধু জানতে চাইলেন, ঔর দোনো কৌন? পণ্ডিতজীকে অলাবা ?

--আজাদ ঔর প্যাটেল। লেকিন তুম যাতে হো কঁহা ? ব্যয়ঠে রহো।

ঘটনার প্রায় পনেরো বছর পরে দণ্ডকারণ্যে স্মৃতিচারণকালে অনিল চন্দ এই পর্যায়ে আমাদের বলেছিলেন, বাপুজী তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে-- অথবা কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতায়-- হয়তো বুঝতে পেরেছিলাম কেন ওই তিনজন সর্বভারতীয় শীর্ষনেতা অতর্কিতে দিল্লি থেকে আহ্মেদাবাদ ছুটে এসেছেন। আরও বলেছিলেন, 'জানি না, বাপুজী ভেবেছিলেন কি না যে-- ওঁরা তিনজন, উনি একা। তাই কি আমাকে উঠে যেতে বারণ করলেন?

সমস্ত কথোপকথন আমার স্মরণে নেই। থাকার কথাও নয়। শুধু দু'একটি মারাত্মক পংক্তি মনে আছে। কারণ তা ভোলা যায় না। একবার শুনলে শ্রুতিধরের মতো আপনারাও তা সারাজীবনে ভুলতে পারবেন না।

জবাহরলালজীই আলোচনা শু করলেন। প্রসঙ্গ ভারতবিভাগ। যুক্তিতর্ক দিয়ে তিনি মহাত্মাজীকে বোঝাতে চাইছিলেন যে, মাউন্টব্যাটেন - প্রস্তাবিত ভারত - বিভাগ স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া কংগ্রেসের সামনে আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। প্রতিদিন সারা ভারতে গড়ে এক হাজার নর-নারী নিহত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।

মহাত্মাজী জানতে চাইলেন অপর দু'জনের মতামত।

আজাদ ও প্যাটেল দু'জনেই ভারত বিভাগের পক্ষে সওয়াল করলেন। ওঁদের মতে, পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে'ভারত বিভাগ' অনিবার্য। যত দেরি হবে মৃতের সংখ্যা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ওঁরা একমত হয়েই বাপুজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছেন।

মহাত্মাজী বেঁকে বসলেন। স্পষ্ট জানালেন, তিনি রাজি নন।

গান্ধীজীর এই প্রতিত্রিয়ার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার মতো পক্ককেশ প্রবীণদের নিশ্চয় স্মরণ হবে,মহাত্মাজীর ঐতিহাসিক উক্তি, 'ভারত যদি বিভক্ত হয় তবে তা হবে আমার মৃতদেহের ওপর।'

এটা ইতিহাসস্বীকৃত।

নতুন তথ্য যেটুকু অনিলকুমার পরিবেশন করেছিলেন তা এই গান্ধীজী বলেছিলেন, অ্যাব্রাহাম লিংকনকেও তাঁর সহকর্মীরা এবং তাঁর জেনারেলরা একই কথা বলেছিলেন আমেরিকাকে দু'টুকরো করে ভ্রাতৃবিরোধের অবসান ঘটানোতে। এবং লিংকন স্বীকৃত হননি। তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন, আমেরিকাকে দু'টুকরো হতে দেননি। আমরাইবা পারব না কেন ? কংগ্রেসের ছোট - ছোট সেবাদল

গঠন করে চল, আমরা এক-এক জন -এক এক দিকে শান্তির বাণী প্রচার করতে জানকবুল রওনা হই।
ওঁরা তিনজন স্বীকৃত হতে পারলেন না।
আবার সবিনয়ে নিবেদন করি কে কী বলেছিলেন, তা পর - পর সাজিয়ে নিয়ে বলতে পারব না। তার মধ্যে আমার কল্পনা অনিবার্যভাবে মিশে যাবে। তবে এটুকু মনে আছে, শেষপর্যন্ত পণ্ডিতজী নাকি বলেন, বাপুজী, পার্টিশন অব ইন্ডিয়া ইজ নাউ এ সেট্‌ল্ড ফ্যাক্ট। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে একমত না হতে পারেন তাহলে নিরপেক্ষ থাকুন।
গান্ধিজী মানতে রাজি হননি। জবাহরলালের কণ্ঠে অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার কার্জন-গর্জনের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন কি না, সে - কথাও বলেননি। শুধু বলেছিলেন, না, আমি তো নিরপেক্ষ নই। আমি ভারত বিভাগের বিপক্ষে। নিরপেক্ষ থাকতে যাব কেন?
প্যাটেল নাকি এই সময়ে বলেন, সে - কথা তো আপনি আমাদের ইতিপূর্বেই জানিয়েছেন। আমাদের তিনজনের বিনীত অনুরোধ--- ও কথা প্রেসকে জানাবেন না।
গান্ধীজী বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, কেঁও? প্রেসকে আমি কখন কী বলব তার নির্দেশ কি আমি তোমাদের কাছে নিয়ে যাব, প্যাটেল?
এই সময়-- অনিল চন্দের স্মৃতিচারণ অনুসারে--- সর্দার প্যাটেল নাকি একটি বেফাঁস উক্তি করে বসেন। বলেন, তাহলে তো আমাদের দেখতে হয়, যাতে আপনার বিবৃতি সংবাদপত্রে না পৌঁছায়।
মহাত্মাজী এতক্ষণ অর্ধশয়ান অবস্থায় আলাপচারী করছিলেন। এ-কথায় হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসেন। প্যাটেলের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলেন, কেয়া কহা? ...ও! ইয়ে বাত হ্যায়। আভি সমঝ্ গয়া।
মুষ্টিবদ্ধ বলিরেখাঙ্কিত শীর্ণ দুটি হাত প্যাটেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, মুঝে অ্যারেস্ট করনা চাহ্‌তে হো? তো করো ! লায়ে হো হ্যান্ডকাফ্?
আজাদ ও জবাহরলালা দু'জনেই একাযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন, ছি! ছি! ছি! এ আপনি কী বলছেন বাপুজি? সর্দার ও কথা স্বপ্নেও ভাবেনি।
এতক্ষণ যা লিখছি-- কখনও ডাইরেক্ট ন্যারেশনে, কখনও ইনডাইরেক্ট--তার অনেকটাই স্মৃতিনির্ভর। কিছুটা আন্দাজে, হয়তো বা কিছুটা কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু এবার যে কয়টি পংক্তি লিখছি তা তিন দশকের ওপর আমার স্মৃতিপটের মণিমঞ্জুষায় সযত্নে সঞ্চিত হয়েছে আছে-- ছেনি- হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করা শিলালিপির মতো।
মহাত্মজী সখেদে বলে ওঠেন, হাঁ, অব্ তুম তিনো ইয়ে বাত কহ্ সকতে হো, কিউ কি মেরা বেটা তো ইহাঁ নেহি হ্যায় না ?
পণ্ডিতজী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, কিস্‌কি বাত কর রহেঁ হ্যঁয় বাপুজী?
--ওয়হ্ বেটা ! যো হম্‌পর অভিমান করকে ঘর ছোড়কে চলা গয়া থা। অব সুনা হ্যয় কি ওয়হ্ বাতানিয়কা সাথ লড়াই করতে হুয়ে শহিদ বন চুকা। আগর্ ওয়হ্ রহ্‌তা, তো ম্যয়ভি দেখ্ লেতা, ক্যায়সে তুম তিনো...
গান্ধীজী 'সেন্টিমেন্টাল' ছিলেন, এ অপবাদ তাঁর শত্রুতেও দেবে না। খুব সম্ভবত বাক্যটা তিনি সেদিন অসমাপ্ত রাখেননি। কিন্তু তার পনেরো বছর পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনিল চন্দ তা পারলেন না। তাঁর গলাটা ধরে এল। বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। পকেট থেকে মালটা বার করলেন।
ইতিহাসের জানা দরকার যে, সুদূর সাইগনের বেতারে কোনও এক দোসরা অক্টোবর তারিখে ব্রিটিশকারাগারের জনৈক বন্দীকে যিনি 'পিতৃসম্বোধন' করে, সর্বপ্রথম 'জাতির পিতা' আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই বুড়ো বাপ তাঁকে,'মেরা বেটা' সম্বোধন করেছিলেন-- নিদাণ অসহায়ত্বে, পরম নিঃসঙ্গতায়, চরম দুর্দিনে।